চতুর্থ অধ্যায়
প্রাক্ আধুনিক যুগে অপ্রধান বাংলা সাহিত্য ধারায় শিব চরিত্রের স্বরূপ

প্রাক্ আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য ধারার প্রধান ধারাগুলি হল— মঙ্গলকাব্যের ধারা, অনুবাদ সাহিত্যের ধারা, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য (চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে), আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিদের রচিত কাব্য। এই প্রধান সাহিত্য ধারার পাশাপাশি এক অপ্রধান সাহিত্য ধারাও বহমান ছিল, তা হল 'নাথ সাহিত্য' ও 'শাক্ত পদাবলী'।

নাথসাহিত্য ও শাক্তপদাবলী এই সাহিত্য শাখা নিয়েই বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। নাথসাহিত্য ও শাক্তপদাবলীতে বর্ণিত শিব চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে, তারই আলোকে শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারাটিকে স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা রইল। তবে নাথসাহিত্যে শিব নাথধর্মের 'আদিনাথ' রূপে এবং শাক্তপদাবলীতে উমা বা গৌরীর স্বামীরূপে উপস্থিত হয়েছেন। শিবচরিত্রের স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা নাথসাহিত্য বা শাক্ত পদাবলীতে নেই। তবুও 'বিবর্তনের ধারায় প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্র' বিষয়ক আলোচনায় উক্ত সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নাথ সাহিত্যে নাথ সম্প্রদায় ও নাথ পন্থীদের ধর্মাচরণের কথা আছে। এই নাথধর্ম শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, ''আর একটি উপধর্ম ও সেই উপধর্মাশ্রিত সাহিত্য শুধু বাংলাদেশে নহে, বাংলার বাহিরে বৃহত্তর ভারতবর্ষে এখনও জনসমাজে চলিতেছে। বাংলার যোগী-সম্প্রদায় (যুগী) এখনও তাহাদের বিহিত কার্যাদি করিয়া যায় এবং বিশেষ ধরনের ধর্মকৃত্য পালন করিয়া থাকে। বাংলার বাহিরেও এই নাথ ধর্ম গোরক্ষ নাথের নামে প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।''[১] এই নাথধর্ম শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, অনেক মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাও এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। নাথ ধর্মে যোগসাধনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ''তন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি আধিদৈহিক ও আধিমানসিক ধারাকে গ্রহণ ও স্বীকরণ করিয়া নাথ ধর্ম আধ্যাত্মমার্গে উন্নীত হইয়াছে।''[২] নাথপন্থীরা ছিলেন আত্মবাদী, দেহের উপর আত্মার জয় ঘোষণা করাই ছিল তাঁদের ধর্মের উদ্দেশ্য। নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ 'যোগ' নামে পরিচিত এবং নাথ ধর্মাবলম্বীরা 'যোগী' বা 'যুগী' নামে পরিচিত। নাথ সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন ও ময়নাবতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গীত।

'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের কবি এবং কাব্যরচনাকাল বিষয়ে বিস্তর মতপার্থক্য বর্তমান। তবে মোটামুটি ভাবে গোরক্ষবিজয়ের তিনজন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়— সেখ ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায়। আবার গোরক্ষবিজয় কাব্যের রচনাকাল নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। মোট আটটি পুথির উপর নির্ভর করে গোরক্ষবিজয় কাব্যটি রচিত হয়েছিল। নকল করা পুথিগুলির লিপিকাল দেখে কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে আন্দাজ করেছেন পণ্ডিতেরা। যেমন— ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের নকল করা কিছু পুথি পাওয়া গেছে। তবে অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গোরক্ষবিজয় কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

নাথ সাহিত্যে তিনজন নাথগুরুর উল্লেখ আছে, তাঁরা হলেন— গোরক্ষনাথ, মীননাথ এবং হাড়িপা। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, এই গোরক্ষনাথের মহিমাই গোরক্ষবিজয় কাব্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনজন সিদ্ধাচার্যের আদিগুরু হলেন শিব। ''তাঁহারা আত্মপন্থী ও মোক্ষবাদী— ঈশ্বরপন্থী নহেন। তাঁহাদের আদিগুরু শিবও শ্রেষ্ঠ যোগী মাত্র— ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপ নহেন।''[৩] নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করতেন শিবের থেকেই যোগসাধনার উৎপত্তি, শিবের কাছ থেকে যোগশিক্ষা নিয়েছিলেন মীননাথ। পরবর্তীকালে মীননাথই গোরক্ষনাথকে যোগবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। ''পৌরাণিক যুগ হইতেই শিবের সঙ্গে যোগ-সাধনার সম্পর্ক ক্রমে স্পষ্ট হইতে আরম্ভ করে। ..... সমান্তরাল ভাবে যোগ-সাধনার ক্ষেত্রে যোগীন্দ্র শিবের নাম এবং তাঁহার একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।''[৪]

নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত শিব চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য এবং 'গোপীচন্দ্রের গান'-এর কাহিনী আলোচনা আবশ্যক। গোরক্ষবিজয় কাব্যে দেখা যায়— সৃষ্টির আদিতে 'আদ্যদেব' এবং 'আদ্যাদেবী'র সৃষ্টি হয়েছিল। পরে আদ্যদেবের শরীর থেকে আরও চারজন সিদ্ধাচার্য শিব, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপার সৃষ্টি হয়। এই চারজন সিদ্ধাচার্যের পর আদ্যদেব একজন কন্যা 'গৌরী'র জন্ম দেন। আদ্যদেবের আদেশে শিব গৌরীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর শিব-গৌরী মর্ত্যে চলে এলেন। অপর তিনজন সিদ্ধাচার্য— মীননাথ, গোরক্ষনাথ এবং হাড়িপা কঠোর তপস্যায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন। পরে তাঁরাও মর্ত্যে এলেন গৌরী ও শিবের সেবা করার জন্য। মর্ত্যে শিব-পার্বতী সুখেই সময় অতিবাহিত করছিলেন। একদিন গৌরী শিবের কাছে তাঁর গলার হাড়ের মালার অর্থ জানতে চান। শিব বলেন, সতী সাতবার মরার পর প্রত্যেকবার সতীর দেহের একটি করে হাড় তিনি কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। এরপর শিব গৌরীকে ঘরে রেখে তপস্যা করতে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন তপস্যা করার পর শিব ফিরে এলেন গৌরীর কাছে।

গৌরীকে দেখে শিবের মনে কামভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু গৌরী শিবের কাছে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিব গোপনে গৌরীকে জন্ম-মৃত্যুর গূঢ় কথা জানানোর জন্য জলটুঙ্গির উপর গৌরীকে নিয়ে যান। দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে গৌরী ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সেই সময় মীননাথ গোপনে থেকে শিবের মুখনিসৃত সেই মহাজ্ঞান শুনে নিলেন। গৌরীকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে শিব বুঝতে পারেন গৌরী তাঁর 'মহাজ্ঞান' পুরো শোনেননি। শিব যোগবলে জানতে পারলেন মীননাথ মাছের রূপ ধারণ করে মহাজ্ঞানতত্ত্ব শুনে নিয়েছেন। শিব ক্রুদ্ধ হয়ে মীননাথকে তার শঠতার জন্য অভিশাপ দিলেন এবং গৌরীকে নিয়ে কৈলাসে বসবাস শুরু করলেন। এরপর চারজন সিদ্ধাচার্য চারদিকে, যেমন— পশ্চিমে গোরক্ষনাথ, পূর্বে হাড়িপা, উত্তরে মীননাথ, দক্ষিণে কানুপা গেলেন যোগ প্রচার করতে। কিন্তু শিবের শিষ্যদের নিয়ে গৌরীর কৌতূহলের শেষ নেই। শিবের শিষ্যরা কেন বিবাহ করেনি এই প্রশ্ন গৌরী শিবকে করেন, শিব জানান— তাঁরা যোগী, সংসার এবং নারী বিষয়ে তাঁরা অনাগ্রহী। শিবের উত্তরে গৌরীর মনে সন্দেহ হয় যে তাঁরা কাম-ক্রোধ-হীন হতে পারেন না, তাই গৌরী শিবের কাছ থেকে অনুমতি নিলেন যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের মনে কামভাব জাগ্রত করে তাদের সংসারী করে তুলবেন। গৌরী কৈলাসে ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। সিদ্ধাচার্যদের খাদ্য পরিবেশনের সময় দেবী মোহিনীরূপ ধারণ করলে সকলেই আকৃষ্ট হলেন। সকলের মনেই কামভাব জাগ্রত হল। শুধুমাত্র গোরক্ষনাথ দেবীকে মাতৃরূপে কামনা করলেন। মীননাথ, কানুপা ও হাড়িপাকে অভিশাপ দিয়ে কদলীনগর, ডাহুকানগর ও ময়নামতীর গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথকে ছলনা করতে গৌরী মাছির রূপ ধরে গোরক্ষনাথের উদরে প্রবেশ করলেন। গোরক্ষনাথ যোগবলে গৌরীর ছলনা বুঝতে পেরে দেহের সমস্ত বাহির পথ বন্ধ করে গৌরীকে ভিতরেই আটকে দিলেন। গৌরীর অদর্শনে শিব গোরক্ষনাথের কাছে আবেদন জানালে তিনি গৌরীকে পায়ুপথে বের করে শিবের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং শিবের আদেশে গন্ধর্ব রাজকন্যাকে বিবাহ করে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। কিছুকাল ঘর করার পর স্ত্রীকে পুত্রসন্তানের বর দিয়ে গোরক্ষনাথ তপস্যা করতে চলে গেলেন। কিছুদিন পর গোরক্ষনাথের পুত্র কর্পটিনাথের জন্ম হয়।

তপস্যারত অবস্থায় গোরক্ষনাথ কানুপার কাছ থেকে জানতে পারেন তাঁর গুরু মীননাথ মোহগ্রস্ত হয়ে মহাজ্ঞান ভুলে কদলীরাজ্যে নারীসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। গুরুকে উদ্ধারের জন্য গোরক্ষনাথ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কদলীরাজ্যে উপস্থিত হলেন। কিন্তু গুরুকে উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পথে জানতে পারেন মীননাথ মঙ্গলা ও কমলা নামে দুই নারীর কাছে বন্দী হয়ে আছেন। সেখানে যেকোন পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষেধ, একমাত্র নর্তকীরাই সেখানে প্রবেশ করতে পারেন। গুরুকে উদ্ধারের জন্য গোরক্ষনাথ নর্তকীর ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজসভায় উপস্থিত হয়েও গুরুর দর্শন পেলেন না। তখন তিনি

মাদলে ‘কায়াসাধ কায়াসাধ’ বোল তুললেন। গোরক্ষনাথের সঙ্গে মীননাথের দেখা হল, কিন্তু মোহে আচ্ছন্ন মীননাথ শিষ্যকে চিনতে পারলেন না। গোরক্ষনাথ মীননাথকে মহাজ্ঞানের কথা স্মরণ করানোর চেষ্টা করলে, মীননাথের রানীদ্বয় মঙ্গলা ও কমলা তাঁদের পুত্র বিন্দুনাথকে নিয়ে এসে মীননাথকে সংসারের মায়ার বন্ধনে বাঁধতে চাইলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ তাঁর কঠোর চারিত্রিক গুণাবলীর জোরে মীননাথকে পূর্বের কথা স্মরণ করালেন। মীননাথকে কদলীরাজ্য ত্যাগ করতে বাধা দেওয়ার জন্য কদলীরাজ্যের রমণীদের গোরক্ষনাথ বাদুড় করে দিলেন। মীননাথ পুত্র বিন্দুনাথকে কদলীরাজ্যের রাজা নির্বাচিত করে গোরক্ষনাথকে সঙ্গে করে কদলীরাজ্য ত্যাগ করে চলে এলেন। গোরক্ষনাথের সংযমী চরিত্রের জন্য দেহের উপর আত্মার জয় ঘোষিত হল।

‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্যের কাহিনী আলোচনার পর ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান-এর কাহিনী বিশ্লেষণ আবশ্যক। যদিও এই কাহিনীতে শিবের কোনো ভূমিকা নেই। তবুও নাথ সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই কাহিনীর আলোচনা প্রয়োজন। ‘গোপীচন্দ্রের গান’ কাব্যটি মোট পাঁচটি খণ্ড এবং ত্রিশটি পালায় বিভক্ত। প্রথম খণ্ড - জন্মখণ্ড, এই খণ্ডে পাঁচটি পালা আছে— মানিকচন্দ্র রাজা, অভিশাপ, বজ্রতৃষ্ণা, যম-যুদ্ধ, গোপীচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ড-বুঝানখণ্ড, এই খণ্ড চারটি পালায় বিভক্ত— রাজ্যভোগ, মাতৃঅপরাধ, ধর্মোপদেশ, জননীর পরীক্ষা। তৃতীয় খণ্ড- পণ্ডিতখণ্ড, পালা আছে দুইটি— অদুনা পদুনার ষড়যন্ত্র, পণ্ডিতের দণ্ড। চতুর্থ খণ্ড- মুণ্ডনখণ্ড, এই খণ্ডেও দুইটি পালা— নাপিতের দুর্বুদ্ধি, রাজার বিচার। পঞ্চম খণ্ড-সন্ন্যাস খণ্ড, এই খণ্ডে মোট ষোলটি পালা আছে। যেমন— যাত্রার উদ্যোগ, জননীর ভিক্ষাদান, পত্নীর ভিক্ষাদান, যাত্রাপথে, অরণ্যপথ, মরুপথ, কলিঙ্গার হাটে, নটীর ক্রীতদাস, প্রলোভন, নটীর রূপসজ্জা, প্রতিহিংসা, পূর্বস্মৃতি, শেষ দুঃখ, রক্তের লিখন, পরিত্রাণের উপায়, প্রত্যাবর্তনের পথে, পুনর্মিলন ইত্যাদি। ‘গোপীচন্দ্রের গান’ কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার হল— মানিকচন্দ্র রাজা ছিলেন পরম ভোগবিলাসী। রাণী ময়নামতী থাকা সত্ত্বেও তিনি আরও পাঁচজন কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর নব-বিবাহিতা স্ত্রীরা ছিলেন প্রত্যেকেই সুন্দরী ও যুবতি। ময়নামতীকে প্রায় ভুলে গিয়ে রাজা নববধূদের নিয়েই সময় কাটাতেন। স্বামীর অবহেলায় রাণী ময়নামতী গোরক্ষনাথের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন করেই দিন কাটাতেন। কিন্তু একদিন রাণী ময়নামতী যোগবলে জানতে পারলেন তাঁর কাছ থেকে মহাজ্ঞানের দীক্ষা না নিলে রাজা মানিকচন্দ্র অকালে মৃত্যু বরণ করবেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে মহাজ্ঞানের দীক্ষা নিতে মানিকচন্দ্রের পৌরুষে আঘাত লাগে। ফলে তিনি স্ত্রীর আবেদন ফিরিয়ে দেন, মানিকচন্দ্র প্রাণ হারালেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের জন্ম হয়। গোপীচন্দ্র বড়ো হলে ময়নামতী তাকে বিয়ে দেন অদুনা ও পদুনা নামক দুই রাজকন্যার সঙ্গে। স্ত্রীদের নিয়ে গোপীচন্দ্র সুখেই ছিলেন। এমন সময় রাণী ময়নামতী

যোগবলে জানতে পারেন আঠারো বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ না করলে গোপীচন্দ্র অকালে প্রাণ হারাবেন। ময়নামতীর গুরুভাই হাড়িপা, অর্থাৎ গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপার কাছ থেকে মহাজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ না করা পর্যন্ত গোপীচন্দ্রের রক্ষা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অল্প বয়সে স্ত্রীদের ছেড়ে, রাজত্ব ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। গোপীচন্দ্রের মনকে তাঁর স্ত্রীরা ময়নামতীর বিরুদ্ধে এতটাই বিষিয়ে দিয়েছিল যে, গোপীচন্দ্র হাড়িপাকে নিয়ে মায়ের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতেও দ্বিধা বোধ করলেন না। ময়নামতী সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে সতী প্রমাণ করে পুত্রের সন্দেহ দূর করলেন। গোপীচন্দ্র মাথা মুণ্ডন করে হাড়িপার কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্ত্রীদের ছেড়ে বারো বৎসরের জন্য বনবাসে চলে গেলেন। হীরা নটী গোপীচন্দ্রকে কামনার দ্বারা বশ করতে না পেরে তাঁকে নানাপ্রকার অত্যাচার করতে লাগল। অতি কষ্টে গোপীচন্দ্রের দিন কাটতে থাকে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গোপীচন্দ্র মা ময়নামতীর কাছে অতি কষ্টে সংবাদ পাঠালেন। ময়নামতি হাড়িপাকে জানালে তিনি লজ্জিত হন। কারণ গোপীচন্দ্রকে হীরা নটীর কাছে বাঁধা রেখে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। হাড়িপা গোপীচন্দ্রকে হীরা নটীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে রাজ্যে ফিরলে কেউই তাকে চিনতে পারলেন না। হাড়িপা গোপীচন্দ্রকে আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান শিক্ষা দেন। ময়নামতী ও অদুনা পদুনা গোপীচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন। গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর যোগ কেটে গেল। এরপর দুই স্ত্রীকে নিয়ে গোপীচন্দ্র সুখেই রাজত্ব করতে লাগলেন। ‘গোপীচন্দ্রের গান’ কাব্যের কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন কবি।

আমার গবেষণার বিষয় যেহেতু শিব চরিত্রের বিবর্তনকে অন্বেষণ করা, সেহেতু ‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্যের শিব চরিত্রকে বিশ্লেষণ করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে আমি আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছি— ‘গোর্খ-বিজয়’, সম্পাদনা - শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৯৭। গ্রন্থটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের মতই কাব্যের শুরুতে আছে ‘দেববন্দনা’ অংশ। এই অংশে বন্দনা করা হয়েছে দেবী ভগবতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, রবি, শশী, ইন্দ্র, বরুণ, বসুমতী, শঙ্কর, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে আদ্যদেব পৃথিবী সৃষ্টির চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সেই সময় তাঁর দেহের ঘাম থেকে প্রথমে মেদিনী, অন্যান্য দেবতা, ত্রিভুবন, আকাশ, পাতাল ও আদ্যাদেবীর সৃষ্টি করেন। এরপর আদ্যদেব সৃজনকর্মের ভার আদ্যাদেবীর উপর দিলেন। আদ্যাদেবী জীবসৃষ্টি এবং জীবের জন্ম-মৃত্যু রহস্য আদ্যদেবের কাছে জানতে চাইলে তিনি তার ব্যাখ্যা সবিস্তারে করলেন এবং তিনি তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে জন্ম দিলেন চারজন সিদ্ধাচার্যের। আদ্যদেবের বদন থেকে জন্ম হল শিবের, নাভি থেকে জন্ম হয় মীননাথের, হাড় থেকে হাড়িপা, কান থেকে কানুপা এবং জটা থেকে গোরক্ষনাথের জন্ম হল। আদ্যদেবের সকল শরীর থেকে জন্ম

হল এক পরম সুন্দরী কন্যা গৌরীর। শিব সকল সিদ্ধাচার্যদের গুরু নির্বাচিত হলেন। গৌরীকে বিবাহ করে শিব কৈলাসে চলে গেলেন—

'আদ্যে গুরু মহাদেব পিছে আর সব,
সাধন্ত সকল সিদ্ধা তরিবারে ভব।
মহাদেব চলি গেল পর্ব্বত কৈলাস,
তথা গিয়া হরগৌরী কৈল গৃহবাস।'[৫]

এরপর হরগৌরী সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে পৃথিবীতে চলে এলেন। মীননাথ এবং হাড়িপা হরগৌরী সেবা করতে মর্ত্যে এলেন। পূর্বদিকে হাড়িপা, দক্ষিণে কানুপা, পশ্চিমে গোরক্ষনাথ এবং উত্তরদিকে মীননাথ যোগসাধনা করতে গেলেন। একদিন হর-গৌরী বসে পৃথিবী সৃষ্টির আদি কথা আলোচনা করছিলেন। সেই সময় গৌরীর মনে হয়, শিব তাঁর দুই স্ত্রী গঙ্গা ও গৌরীকে নিয়ে ঘর করছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা সকলেই অবিবাহিত—

'সর্ব-দেব-মুখ্য তুহ্মি সৃষ্টির কারণ,
গঙ্গা গৌরী দুই নারী সাক্ষাতে সমান।
মহাদেব বলে তান মনে হেন নাই,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিল এড়াই।'[৬]

শিষ্যরা সকলেই কাম-ক্রোধ বর্জিত, তাই তারা নারী সঙ্গ কামনা করেন না। মহাদেবের উত্তরে গৌরী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি শিবকে প্রস্তাব দেন, সামান্য কটাক্ষেই তিনি তাঁদের মনে কামভাবের জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। শিব ধ্যানস্থ হলেন এবং যোগ বলে তাঁর সকল শিষ্যদের অর্থাৎ মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপাকে ডেকে পাঠালেন। সকল সিদ্ধাচার্যদের দেবী বসার আসন দিলেন, কামবাণে দেবী সকল সিদ্ধাচার্যদের বশ করলেন। অন্ন-জল পরিবেশনের সময় দেবীর মোহিনীরূপ দেখে মীননাথ মনে মনে ভাবলেন—

'কহিলেন মীননাথ মনে মায়া ধরি,
জগতেত পাই যদি এমন সুন্দরী।
বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই,
রঙ্গ-কৌতুক-রসে রজনী গোয়াই।'[৭]

গৌরীর অভিশাপে মীননাথ কদলীরাজ্যে প্রেরিত হলেন, হাড়িপা গেলেন রাণী ময়নামতীর গৃহে এবং কানুপা ডাহুক নগরে চলে গেলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ গৌরীকে মাতৃরূপে কামনা করলেন—

'তবে ভাবিলেক মনে গোর্খে করি সার,
এমত জননী যদি থাকএ আমার।'[৮]

গোরক্ষনাথকে ছলনা করতে দেবী ব্যর্থ হলেন। শিব খুশী হলেন, কারণ গোরক্ষনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য। গৌরী তবুও নিরাশ হলেন না, তিনি গোরক্ষনাথকে ছলনা করার অন্য উপায় বের করলেন—

‘তানে যদি না পারিলা তুমি ভুলাইতে,
রাখিল মহিমা মোর গোর্খ অবধূতে।’[৯]

গোরক্ষনাথকে ছলনা করার কথা গৌরী ভোলেননি। গোরক্ষনাথের পথে দেবী বিবসনা হয়ে শুয়ে ছিলেন, দেবীর লজ্জা গোরক্ষনাথ বৃক্ষের পত্রের মাধ্যমে নিবারণ করলেন। দেবীও নিজকর্মের জন্য লজ্জা পেলেন। এরপর গৌরী ‘মাছি’ রূপ ধারণ করে গোরক্ষনাথের উদরে প্রবেশ করেন। গোরক্ষনাথ যোগবলে গৌরীর ছলনা বুঝতে পেরে বাইরে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেন। এবার গৌরী বুঝতে পারেন গোরক্ষনাথকে পরাজিত করা তাঁর কাজ নয়। গৌরী অনুনয়-বিনয় করেন বাইরে বের হবার জন্য। গোরক্ষনাথ তাঁকে মার্গপথে বাইরে বের করে দিলেন, তবে দেবী রাক্ষসীরূপে এবার অবস্থান করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন গৌরীকে দেখতে না পেয়ে শিব গৌরীকে খুঁজতে বের হলেন। গোরক্ষনাথের কাছে শিব গৌরীর সন্ধান জানতে চান—

‘এথাতে না পাই শিব দেবী দরশন,
গোর্খেরে ধরিয়া শিব করে কদর্থন।
কোথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা,
শিবের বচনে গোর্খ হাসিতে লাগিলা।’[১০]

কিন্তু উত্তরে গোরক্ষনাথ যা বলেছে, তার মধ্য দিয়ে শিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যেমন— শিব যে নেশাগ্রস্ত, গোরক্ষের উক্তিতে তা প্রমাণিত—

‘ভাঙ্গ ধূতুরা খায় তুমি কি বলিব তোরে,
কোথাতে হারাইয়া নারী ধর আসি মোরে।’[১১]

এরপর শিব গৌরীর অন্বেষণে বের হলেন। কিন্তু আদিগুরু শিবের এই অস্থিরতা গোরক্ষনাথকেও বিচলিত করে। গৌরীকে ফিরিয়ে দিতে তিনি কৈলাসে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে গোরক্ষনাথের জন্য অপেক্ষা করছিল অন্য চমক। শিবের নির্দেশে গোরক্ষনাথ এক গন্ধর্ব রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। যদিও তিনি দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হননি। স্ত্রীকে সুসন্তানের বর দিয়ে গোরক্ষনাথ তপস্যা করতে চলে গেলেন। এরপর গোরক্ষনাথের পুত্র কর্পটিনাথের জন্ম হয়।

তপস্যারত অবস্থায় গোরক্ষনাথ কানুপার মাধ্যমে জানতে পারেন গুরু মীননাথের পথভ্রষ্ট হওয়ার সংবাদ। গোরক্ষনাথ কদলীরাজ্যে গিয়ে মীননাথকে তাঁর পূর্বকথা, তাঁর মহাজ্ঞান তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান। শিব তাঁদের সকলের গুরু, আদিনাথ।

শিবের কথা বলে গোরক্ষনাথ মীননাথকে সঠিক পথে ফেরানোর চেষ্টা করেন। এর মধ্য দিয়ে শিব চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়। গোরক্ষনাথ মীননাথকে বলেন— শিব তাঁর গুরু। শিব সর্বভোগী, ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, নারী সঙ্গে সময় কাটায়, জগৎ উদ্ধারের জন্য বিষ পান করে।

গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র করে নাথ সাহিত্য আবর্তিত হলেও তাঁদের আদিগুরু ছিলেন শিব। তবে এই শিব পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত শিব থেকে আলাদা। বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক শিব চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এখানে তার প্রায় সবটাই অনুপস্থিত। নাথ ধর্মকে শিব কোনোভাবেই প্রভাবিত করেন নি। তবে যোগী সমাজে প্রচলিত আছে যে, নাথ ধর্ম হল শৈব এবং গোরক্ষনাথ হলেন শিবের অবতার। নাথ সাহিত্যে শিবের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি দেখা যায় যেখানে তিনি গৌরীর সঙ্গে মহাজ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনায় মগ্ন। নাথধর্মের চারজন প্রধান সিদ্ধাচার্য মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা ছিলেন শিবের শিষ্য। তবে নাথধর্মে নাথসিদ্ধাচার্যদের যে তালিকা আছে সেখানে প্রথম স্থানে আছেন শিব। তবে শিব এখানে দেবতা নয়— ''নাথ যোগীদের মত শিবও একজন সিদ্ধ যোগী। তিনিও মীননাথ-গোর্খনাথ-হাড়িপা-কানুপার মতই ধর্ম-নিরঞ্জনের পুত্র। তবে তিনি যোগী সিদ্ধদের অগ্রজ গুরু, এবং মীননাথ ও হাড়িপা তাঁহার অনুজ অনুচর।''[১২] নাথধর্মে নাথসিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু রূপে শিবের যে রূপ তা গোরক্ষবিজয় কাব্যে বর্ণিত হয়েছে—

'মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা,
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা।'[১৩]

শিবের গলায় মুণ্ড ও হাড়ের মালা, গায়ে ভস্ম বা ছাই মাখা, কাঁধে ঝুলি ও ছালা রয়েছে। শিবের এই রূপ মঙ্গলকাব্যের শিব চরিত্রকে স্মরণ করায়। যদিও নাথ সাহিত্যে যে সামান্যতম অংশে শিবের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে তাঁর বৈদিক বা পৌরাণিক রূপের কোন লক্ষ্মণ নেই।

নাথ সাহিত্যে শিব চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট সেগুলি হল— শিব একাধিক স্ত্রীকে নিয়ে একই গৃহে বাস করেন। শিবের একাধিক স্ত্রীর কথা উল্লেখ থাকলেও অপর স্ত্রী গঙ্গার কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। শিব নেশাখোর, ভাঙ্গ-ধুতুরা খেয়ে নেশা করেন। ভস্মভূষিত, হাড়মালা পরিহিত শিব ভিখারী। স্ত্রীর সঙ্গে নানা তত্ত্ব আলোচনা নিয়ে মুগ্ধ থাকেন। তপস্যারত ভক্তকে বর দান করেন। শিব চরিত্রের মানবিক দিক ফুটে উঠেছে, যখন গৌরী গোরক্ষনাথের উদরে বন্দী ছিলেন, সেইসময় শিব গৌরীকে খুঁজেছিলেন। শুধু তাই নয়, গোরক্ষনাথের কাছে শিব গৌরীকে খুঁজে দেওয়ার আবেদনও

করেছেন। যাই হোক, নাথধর্মের বৈশিষ্ট্য বহন করে এক স্বতন্ত্র শিব চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন।

'শাক্ত পদাবলী' বাংলার অপ্রধান সাহিত্য ধারার এক অমূল্য সম্পদ। শক্তি অর্থাৎ দেবী কালিকা বা উমা বা গৌরী বা পার্বতী বা দুর্গাকে নিয়ে রচিত গানই শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাক্ত পদাবলীর পদকর্তারা 'পদাবলী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শাক্ত পদাবলীতে দেবী কালিকার আরাধনা করেছেন শাক্ত পদকর্তারা। তাঁরা দেবীর বাল্যলীলা থেকে শুরু করে ব্রহ্মময়ী মাতৃরূপের বন্দনা করেছেন।

শাক্ত পদাবলী শক্তির আরাধনার কাব্য। ''শক্তি-বিষয়ক সংগীত বা শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। একান্ত জীবননিষ্ঠ, অপূর্ব সুরময়, বিচিত্র কবিত্বপূর্ণ, মাতৃদেবীর অনন্ত মহিমাব্যঞ্জক এই গান যেমন ভক্তির উদ্বোধক, তেমনই প্রাণোন্মাদক।''[১৪] শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ঘটেছিল। তবে শাক্ত পদাবলীর বিস্তার ঘটেছিল আধুনিক যুগ অর্থাৎ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে। এবিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রণিধানযোগ্য, ''চণ্ডীমঙ্গল বা ভবানীমঙ্গল ধরণের সাহিত্যে এবং শাক্তপুরাণের বাংলা অনুবাদে শাক্তপদাবলীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বিশিষ্ট কাব্যশাখারূপে শাক্তপদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সর্বাধিক প্রাধান্য অর্জন করে।''[১৫]

শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসেবে রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম উচ্চারিত হয়। এছাড়াও আরও অনেক কবি শাক্তপদাবলীর পদ রচনা করেছেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, অমৃতলাল বসু, দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা), রসিক চন্দ্র রায়, রজনীকান্ত সেন, রাধিকাপ্রসন্ন, উদয়চাঁদ বৈরাগী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ চৌধুরী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, রাম বসু, এন্টনী সাহেব, রূপচাঁদ পক্ষী, হরিমোহন রায় প্রভৃতি পদকর্তা ছাড়াও আরও বহু পদকর্তা শাক্তপদাবলীর পদ রচনা করেছেন। পদকর্তারা যে সকল শাক্তপদ রচনা করেছেন, সে সকল পদকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে রয়েছে উমার বাল্যলীলা ও আগমনী-বিজয়া বিষয়ক পদ, অপরদিকে দেবী কালিকাকে মাতৃরূপে আরাধনা। আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক পদে রয়েছে হিমালয় ও মেনকার সংসার, উমা তাদের কন্যা। আর রয়েছে শিব-উমার সংসার।

প্রাক্ আধুনিক যুগের অপ্রধান সাহিত্যধারায় শিব চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া গানে উমার স্বামীরূপে শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। উমা গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা, উমার বিবাহ

হয়েছে অকিঞ্চন শিবের সঙ্গে। সারাবছর উমা কৈলাসে স্বামীর ঘর করেন, দারিদ্র তাঁর নিত্যসঙ্গী। রাজার কুমারী উমা বছরে মাত্র তিনদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসেন। নবমীর নিশি অবসানের পূর্বেই শিব আসেন উমাকে নিতে। বৎসরান্তে মেয়েকে একবার কাছে পেতে গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকা ব্যাকুল হয়েছেন। তাঁদের জবানীতে জামাতা শিবের স্বরূপ পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক পদগুলি বিশ্লেষণ করে শিব চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা রইল। শাক্ত পদাবলীর পদগুলি আলোচনার জন্য আমি আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছি যে গ্রন্থটিকে, তা হল— শাক্ত পদাবলী (চয়ন), সম্পাদনা-শ্রী অমরেন্দ্র নাথ রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ-১৯৪২, দ্বাদশ সংস্করণ-২০১০।

শাক্তপদাবলীতে শিব নিজে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলেও উমার স্বামীরূপে তাঁর উপস্থিতি শাক্তপদাবলীতে পরিলক্ষিত হয়। শাক্ত পদাবলীর পদগুলিকে বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন— বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকূতি, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা, করুণাময়ী মা, কালভয়হারিণী মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, মাতৃপূজা, সাধন-শক্তি, নাম-মহিমা, চরণ-তীর্থ ইত্যাদি। গিরিরাজ ও মেনকার কথোপকথনে শিবের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। মেনকা স্বামী গিরিরাজকে অনুরোধ করেছেন কন্যার সঙ্গে জামাতাকেও গিরিপুরে নিয়ে আসতে—

‘জামাতা সহিতে আনিয়ে দুহিতে,
গিরিপুরে কর্‌রো শিব-স্থাপনা।
ঘরজামাতা করে রাখ্‌বো কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে কর্‌বো দ্বিতীয় কৈলাস।
হর-গৌরী চক্ষে হের্‌বো বার মাস,
বৎসরান্তে আন্‌তে যেতে হবে না।
সপ্তমী, অষ্টমী, পরে নবমীতে মা যদি আসে,
হর আসবে দশমীতে।
বিল্বপত্র দিয়ে পূজ্‌বো ভোলানাথে,
ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না।।’[১৬]

এই পদটির পদকর্তার নাম অজ্ঞাত। এখানে শিবকে ঘরজামাই করে রাখার বাসনা প্রকাশ করেছেন মেনকা। তিনদিনের জন্য স্ত্রী বাপের বাড়িতে এলে শিব সময়মতো নিতে চলে আসেন, একদিনও বেশি স্ত্রীকে তিনি গিরিপুরে রাখতে রাজি নন। তবে মেনকার কথায় শিব চরিত্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত, শিব সামান্য বিল্বপত্রেই সন্তুষ্ট, তাঁকে ভোলানোর জন্য বড় কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই।

উমা বাপের বাড়ি এলে মেনকার সাধ তিনদিনে মেটে না। তাই জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতেও মেনকার দ্বিধা নেই। রামপ্রসাদ সেন রচিত পদে দেখা যায়—

'যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে— ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।'[১৭]

অর্থাৎ শ্বশুর বাড়িতে শিবের অবস্থান এমন যে, জামাইয়ের সঙ্গে শাশুড়ী ঝগড়া করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। উমাকে কৈলাসে না পাঠানোর কারণ হিসেবে মেনকা শিবের শ্মশানে ঘুরে বেড়ানোর কথা বলেছেন। কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁর পদে উমার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়েছেন। শিব উমাকে বহু যত্ন করেই রেখেছেন— 'হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে।' কমলাকান্ত ভট্টচার্য্য রচিত অপর একটি পদে মেনকার খেদোক্তির মধ্য দিয়ে শিবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—

'গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে কর একবার।'[১৮]

এই পদ থেকে স্পষ্ট হয় যে শিব ভিখারী, তাঁর হাতে আছে শূল বা ত্রিশূল। এমন শূলপাণি ভিখারীর হাতে কন্যাকে সমর্পণ করে গিরিরাজ অনুচিত কাজ করেছেন।

রাম বসুর রচিত একটি পদে শিব চরিত্রের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সুন্দর সহজ-সরল ভাষায়। মেনকা গিরিরাজকে অনুরোধ করেছেন—

'যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
হারা তারাধন।'[১৯]

গৌরীকে বাপের বাড়িতে আনার জন্য শিবের অনুমতি প্রয়োজন। তবে শিব অল্পেই সন্তুষ্ট, বেলপাতা, চন্দন আর গঙ্গাজল পেলেই তিনি খুশী হন। এই সামান্য আয়োজনেই তুষ্ট হয়ে শিব উমাকে পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। পদকর্তা রাম বসু শিবের পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী শিবের চারজন পুত্র ও কন্যা। আলোচ্য পদে পদকর্তা শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর আভাস দিয়েছেন। দক্ষ ও প্রসূতির কন্যা সতী দক্ষালয়ে শিব নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেন। শিবের জীবনে উমা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, মা মেনকা গিরিরাজের কাছে তা ব্যক্ত করেছেন—

'শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্যতারা।
দুঃখ-পাসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী,

গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব,
আমরা এমন ঝি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই।'[২০]

উমা শিবের 'নয়ন তারা' অর্থাৎ শিবের জীবনে উমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এছাড়াও গৌরী বা উমার আজ্ঞাকারী শিব। শিবের মতো জামাই মেনকা বার বার কামনা করেছেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁর একটি পদে উমার খেদোক্তির মধ্য দিয়ে শিবের বহিরঙ্গ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন—

'দেব দিগম্বরে সঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে।।
হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায় কাল-ফণী দুলিছে।
শিবের সম্বল ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন ভুলেছে।।
একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধুনী, স্বামী-সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।।'[২১]

এই পদের মধ্যে শিব চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, তা মঙ্গলকাব্যের শিব চরিত্রকে স্মরণ করায়। শিব দিগম্বর, তাঁর বসন বাঘছাল, হাড়ের মালা তার অহংকার, মাথায় জটা সেখান থেকে সাপ ঝুলছে। শিব ধুতুরার ফল খেয়ে নেশা করেন, তার উপর শিবের অপর স্ত্রী গঙ্গাকে নিয়ে শিবের আদিখ্যেতা। সুতরাং উমাকে স্বামীর উদাসীনতার সঙ্গে সঙ্গে সতীনের জ্বালাও সহ্য করতে হয়। এই শিব পৌরাণিক ও মঙ্গলকাব্যের শিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে জারিত।

পদকর্তা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পদে শিবকে দেখা যায় ভিখারী রূপে। শিব দ্বিতীয় স্ত্রী গঙ্গাকে উমার থেকে বেশী ভালোবাসেন। তাই গঙ্গা শিব-সোহাগিনী হয়ে উমাকে অপমান করে সর্বদা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে শিব ভিক্ষা করে, তবে সংসার প্রতিপালনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। তাই পেট ভরে খাওয়া জোটে না সকলের। সন্ধ্যে হলেই শিব নেশা করে আপন রসে মজে থাকেন। তাঁর সন্তানেরা খেতে পেয়েছে কি না, সে বিষয়েও শিবের কোনো আগ্রহ নেই। এমন স্বামী পেয়ে উমা সংসার জ্বালায় জর্জরিত হয়েছেন। এই শিব চরিত্রকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সর্বত্রই দেখা গিয়েছে—

'শিরে সুর-তরঙ্গিণী, হ'য়ে শিব-সোহাগিনী,
করি' কলকল ধ্বনি, করে অপমান।
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান।।
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে সিদ্ধিরস পান।

ধুতুরার ফল খায় অমৃত সমান।
আছে কিনা ছেলেমেয়ে, রাখে না সন্ধান।।'[২২]

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের একটি পদে শিবের বহিরঙ্গ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের পরিধানে বাঘছাল, মাথায় জটাভার, শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান ভূত-প্রেত নিয়ে, সর্বাঙ্গে চিতা-ভস্ম মাখা, সাপ তাঁর অঙ্গের ভূষণ, অমৃত ত্যাগ করে তিনি বিষ পান করেন। শাক্তপদাবলী 'আগমনী' গানে পদকর্তারা পৌরাণিক ও লৌকিক শিব চরিত্রের আদলে শিব চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন—

'পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাভার।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যার তারে,
কত আছে কপালে উমার।।
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই;
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণি-হার।
এ কথা কহিব কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার।।'[২৩]

গিরিরাজ হিমালয় বৎসরান্তে একবার কন্যা উমাকে আনতে কৈলাসে গিয়েছেন। কিন্তু শিব, উমার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না। তিনি নিজেকে মণি হারা ফণির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

'বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে।'[২৪]

কিন্তু গৌরী বছরে একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য শিবের অনুমতি চেয়েছেন। কার্তিক, গণেশকে নিয়ে সপ্তমী তিথিতে পিতৃগৃহে গিয়ে নবমী নিশি অবসান হলেই ফিরে আসবেন কৈলাসে। উমা বার বার শিবের কাছে অনুমতি চেয়েছেন—

'হর, কর অনুমতি, যাই হিমালয়ে;
জনক-জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয়!'[২৫]

উমার মিনতি শুনে বিগলিতপ্রাণ হয়ে উমাকে অনুমতি দিয়েছেন। কারণ উমার আবদার কখনো শিব অমান্য করেন না। আর পিতৃগৃহে যাওয়া তো অন্যায় নয়। তাই শিব শুধু উমাকে নয়, নিজেও শ্বশুরবাড়ি যেতে চেয়েছেন—

'জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার ?
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর!
আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিক প্রাণেশ্বরি কেঁদোনাকো আর।'[২৬]

বহুদিন পর কন্যা উমাকে কাছে পেয়ে মা মেনকা সোহাগে-আদরে মেয়েকে ভরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু মেয়ের মলিন রূপ দেখে মা মেনকা খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন জামাইয়ের বিরুদ্ধে। ভিখারী শিবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। শিব পাগল, সম্বল বলতে তার কিছুই নেই, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে বেড়ায়, শিবের কপালে আগুন অর্থাৎ ত্রিনয়ন, মাথায় জটাভার পরনে বাকল, মণি ত্যাগ করে ভূষণ করেছেন ফণীকে, অঙ্গে চিতাভস্ম মাখা। এহেন শিবের সঙ্গে কন্যার বিবাহ অনুচিত হয়েছে। শিব নিন্দার মধ্য দিয়ে এখানে শিবের স্বরূপ সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। পদকর্তা অম্বিকাচরণ গুপ্ত তাঁর রচিত একটি পদে শিবের বহিরঙ্গ রূপের পাশাপাশি আরও একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এখানে শিবকে দেবাদিদেব রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্রও অকিঞ্চন শিবের সামনে নতমস্তক হন, সুতরাং তিনি দেবতাদেরও পূজ্য—

‘পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তবে বিশ্বেশ্বর,
ভস্মমাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপর।
সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ এক মনে, মস্তক নমিত করে।।’[২৭]

শিব কিন্তু উমাকে ছেড়ে থাকতে অপারগ। তাই নবমীর রাত শেষ হতে না হতেই স্ত্রী-সন্তানদের নিতে চলে এসেছেন গিরিপুরে। কিন্তু কন্যাকে ছেড়ে দিতে মায়ের মন মানে না। তাই সকাল সকাল কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ উমাকে ভোজন করান মেনকা এবং বেদনাদীর্ণ হলেও কন্যাকে কৈলাসে পাঠাতেই হবে একথা মেনে নেন তিনি।

‘আগমনী’ গানে যেমন উমার পিতৃগৃহে আসার কাহিনী রয়েছে, তেমনি ‘বিজয়া’ গানে আছে উমার পিতৃগৃহ ত্যাগ করে কৈলাসে ফিরে যাওয়ার কাহিনী। এই বিজয়া গানেও শিব অনিবার্যভাবেই উপস্থিত হয়েছেন উমার স্বামীরূপে। মেনকা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন— দশমীতে কৈলাসে ফিরে গেলে আবার উমাকে নিত্য অভাবের মধ্যে পড়তে হবে। শিব ভিক্ষা করে ঘরে তন্ডুল আনলে তবে ঘরে হাঁড়ি চড়বে, উমার দুঃখ বোঝার কেউ নেই। শিব নেশাগ্রস্ত, ভাঙ্গ-ধুতুরা খেয়েই সময় কাটান। সুতরাং উমার দুঃখ বোঝার কেউ নেই কৈলাসে। এরকম শিবকে মেনকা জামাই বলে মানতে নারাজ—

‘বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই বলে;
যায় যাবে সে, গেলে চ’লে-যা হয় তখন দেখবো পরে।’[২৮]

কিন্তু শিব নবমীর রাত পোহাতে না পোহাতেই গিরিপুরে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর ডম্বরুর ধ্বনি শুনে মেনকার বুক আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছে। তবুও কন্যাকে ধরে রাখতে

তিনি অপারগ। শিব দশমীতে উমা এবং চার সন্তান কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে গেলেন।

'শাক্ত পদাবলী'র আগমনী ও বিজয়া গানে পদকর্তারা যে শিবকে উপস্থাপিত করেছেন তিনি প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে অর্থাৎ গিরিরাজ, মেনকা ও উমার কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছেন। শিবের একমাত্র সক্রিয় উপস্থিতি দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত একটি পদে। সেখানে শিব উমাকে আনতে গিরিপুরে যাবেন বলে কথা দিয়েছেন। তবুও শাক্তপদাবলীতে শিবের প্রধান পরিচয় তিনি গিরিরাজ হিমালয় এবং মেনকার কন্যা উমার স্বামী। উমাকে কেন্দ্র করেই তাঁর সক্রিয়তা। এখানে শিব সংসারী পুরুষ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে সংসার করলেও জীবিকা গ্রহণে তাঁর অনীহা, কখনো আবার ভিক্ষাই তাঁর জীবিকা। ভূত-প্রেত-অনুচরদের নিয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। তিনি নেশাগ্রস্ত, ভাঙ্গ-ধুতুরা খেয়ে নেশা করেন। তবুও স্ত্রীর অদর্শনে ব্যাকুল হন, তিনি স্ত্রীর অনুগত স্বামী। শিব দুই স্ত্রী গঙ্গা ও উমাকে নিয়ে একত্রে সংসার করছেন। তিনি অল্পেই তুষ্ট, তাই তিনি ভোলানাথ। আবার শিবের ঘরজামাই হওয়ার প্রসঙ্গও পদকর্তা উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু শিব কৈলাসেই থেকেছেন, গিরিপুরে আসেননি। শাক্ত পদাবলীতে শিব চরিত্রের দৈবী ভাব দেখা যায় অম্বিকাচরণ গুপ্তের পদে, যেখানে দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করেছেন। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের রুদ্ররূপ যেমন শাক্তপদাবলীতে শিবের মধ্যে দেখা যায় না, তেমন মঙ্গলকাব্যের শিবের মতো তিনি কামুক বা পরস্ত্রীতে আসক্ত নন। শিব চরিত্রের স্থূলতার দিকটি শাক্ত পদকর্তারা বর্জন করেছেন। শাক্ত পদকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উমার স্বামী শিব সংসারী, একটু নেশাখোর, স্ত্রীর বাধ্য স্বামী, অলস, কর্মবিমুখ। শাক্তপদাবলীর শিব তাই আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র।

তথ্যসূচী :

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - তৃতীয় খণ্ড - প্রথম পর্ব, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ - ১৯৬৬, চতুর্থ সংস্করণ-২০০৯-১০, পুনর্মুদ্রণ-২০১৫-২০১৬, পৃষ্ঠা - ২২৬

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - তৃতীয় খণ্ড - প্রথম পর্ব, ঐ, পৃষ্ঠা - ২২৭

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - তৃতীয় খণ্ড - প্রথম পর্ব, ঐ, পৃষ্ঠা - ২৪৫

৪. গোপীচন্দ্রের গান - সম্পাদনা ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৯, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা - একুশ

৫. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৮
৬. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, পৃষ্ঠা - ৯
৭. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, পৃষ্ঠা - ১০
৮. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, পৃষ্ঠা - ১১
৯. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, পৃষ্ঠা - ১২
১০. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, পৃষ্ঠা - ২০
১১. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, পৃষ্ঠা - ২০
১২. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, নাথ পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য - সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা - অনুল্লেখিত
১৩. গোর্খ-বিজয়, সম্পাদনা - পঞ্চানন মণ্ডল, ঐ, নাথ পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য - সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা - অনুল্লেখিত
১৪. শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা - শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী, ডি.এম. লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ - ২রা চৈত্র ১৩৬৩, সপ্তম সংস্করণ - ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ - ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১
১৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - তৃতীয় খণ্ড - প্রথম পর্ব, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ - ১৯৬৬, চতুর্থ সংস্করণ-২০০৯-১০, পুনর্মুদ্রণ-২০১৫-২০১৬, পৃষ্ঠা - ২৯৫
১৬. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৩
১৭. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৩
১৮. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৫
১৯. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৬
২০. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৭
২১. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৮
২২. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৯-১০
২৩. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ১০
২৪. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪
২৫. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ১৭
২৬. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ১৭
২৭. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৩
২৮. শাক্ত পদাবলী, সম্পাদনা - শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৪১